চোখে চোখে
আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

কথা হয়নি। মুখে কিছু হয়েছিলো। সিটিং রুম ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। রোগাক্রান্ত ময়ুরের খয়াটে নীল ছিলো কার্পেটের লম্বা আভায়। আমাদের কোণে ম্যাগাজিন স্টান্ড, অন্য কোণে বড় চিনেমাটির ফুলদানীতে সত্যিকারের ল্যাভেন্ডার। তার জীর্ণ, মেঠো, সুতীব্র, বেগনি, বিষণ্ন সুগন্ধ আমাদের মাঝেমাঝি এসেছে। এত জল আমি মেয়েটার দিকে তাকাতেও পারছি না, বারবার হাতের টিস্যুতে চোখ মুছছি; অথচ সে আমাকে দেখছিলো। সম্ভবত সুস্থির চোখে। হঠাৎ উঠে এসে যখন আমার পিঠে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়লো, দেখলাম ওর চুল কালো, চোখের মণি কালো চকচকে, কচি, ফর্সা, নিটোল ভিক্তোরিয় আয়নার মতো উপবৃত্ত মুখ। আমার চেয়ে বেশ ক'বছরের ছোট মনে হলো তাকে। আর নাম ঝাকলিন - ফরাসী। বা, জ্যাকি - আমেরিকান। কেননা মেয়েটা মার্কিন। ফরাসী বংশোদ্ভূত। তাইতো ফরসা।

- কিছু হয়েছে? আর ইয়্যু অলরাইট?

[জ্যাকি তখনো তার নাম বলেনি। এটা যখন জিজ্ঞেস করছে ঠিক তখনই আমার জলীয় বেগ তীব্রতর হলো ফলে তার সুমুখটা ঝাপসায় হারালাম। অন্ধের গন্ধপ্রবণতা যে তীব্র হয় তার প্রমাণস্বরূপ ল্যাভেন্ডার ভেদ করে ঝাকলিনের ভেতরদিককার একটা শুকনো কি-জানি পারফিউম পেলাম।]

- আমি ঠিক আছি। কিছু হয়নি। চোখের সমস্যা। আইরাইটিস হয়েছে।
- সেটা কি?
- একধরণের ইনফ্ল্যামেশন। অনবরত বিনাকারণে জল পড়ে যাচ্ছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
- মানে আপনার কোনো ট্রাজেডি হয়নি?
- না তো।
- বাঃ!
- ওভাবে বলছন কেন?
- আমাকে একটু কান্না ধার দিন প্লিজ। একটু জল।
- কেন?
- আমার মা মারা গেছে কাল। মাত্র ৫৩ বছর বয়স। কোনো অসুখ ছিলো না... [বলতে বলতে ঝাকলিনের কথায় জলের তোড় আসে, কিন্তু চোখে না। সে একটু থামে... তারপর...] আচমকা। অথচ আমি কাঁদতে পারছি না। কাঁদছি। কিন্তু চোখে জল আসে না।
- আশ্চর্য! আহা!

[আমি ওর হাত ধরি, সেই মুহূর্তে জল আমাকে ক্ষমা করে, আমরা সরাসরি চোখে চোখে সেতু তৈরি করি। ক্লদ মনের জাপানী ব্রিজ। নিচে গোলাপী পদ্ম। হাওয়ায় উড়ছে। বহুদিন পরে ভ্রমর - তার গুঞ্জন পাচ্ছে। দুজনে সেই সেতুর দুদিক দিয়ে উঠে ঠিক মাঝখানটায়, ঠিক শাহরুখ আর কাজলের মতো আমি আর ঝাকলিন তখন যন্ত্রসঙ্গীত ছাড়া মনে মনে গান করি। নিশ্চুপে। কি একটা ফিউনারাল গান। এক মিনিট গাই। আর তারপরেই আমার ডাক এলো।]

চোখের জলের হয়না কোনো রঙ

ডক্টর রোডমাখার শহরের সুনামী অপ্থ্যাল্মলজিস্ট। এই অসুখ, এই উপসর্গ নিয়ে ওর কাছে এই প্রথমবার নয়। সব দেখে টেখে ওষুধ লিখছেন, ইতিমধ্যে জানা টোটকার কথাই বলছেন, তখন আমি হিউমারবশত ঝাকলিনের কথা তুলি - বাইরে যিনি নেক্সট পেশেন্ট অপেক্ষা করছেন, তিনি আবার চোখে জল আনতে পারছেন না, উল্টো ব্যাপার...

কি একটা ভেবে ডক্টর রোডমাখার আমার অনুমতি চাইলেন ওঁকে এই ঘরে আনার জন্য। আমার কোনো অসুবিধে নেই, যদি জ্যাকি রাজি হয়। সে এলো। তারও কোনো অসুবিধে নেই চোখের সমস্যার কথা আমার সামনে বলতে। সব শোনার পর ডক্টর আমাদের দুজনের দিকে বার কয়েক চাইলেন তারপর যা বললেন তার সারমর্ম আমরা বুঝলাম এবং পরের শনিবার একসাথে ডক্টর জাইলিন্ডের চেম্বারে হাজিরা দিলাম। রোডমাখার বলে দিয়েছিলেন যে জাইলিন্ডও অপ্থ্যাল্মলজিস্ট কিন্তু এখন জিনচর্চা করেন এবং এই যে - সাইকো-ল্যাক্রিমাল থেরাপি - একে এখনো পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বলা হয়। এতে যে কিছু সারবেই তার ঠিক নেই, উপরন্তু নানা মানসিক ও আনুভূতিক ঝুঁকি নেবার ব্যাপার আছে।

ডক্টর রোডমাখার আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন যে আমার আইরাইটিস বা ইউভিয়াইটিস হয়েছে। এ অসুখ ঠিক অসুখ নয় এক অবস্থা, ইডিওপ্যাথিক - অর্থাৎ কেন হয় তার কোনো ব্যাখ্যা নেই; HLA-B27 নামে একটা খারাপ জিন আমার আছে, এবং এর কারণেই চোখের এই স্ফীতাবস্থা, এই নিরন্তর অশ্রুসজলতা, এই ফেক-কান্না। এর কোনো চিকিৎসা নেই স্টেরয়েডের ফোঁটা দেওয়া ছাড়া যার দীর্ঘকালীন ব্যবহার থেকে চোখে ছানি, গ্লকোমা ইত্যাদি হাজারো খারাপ জিনিস হতে পারে; আর রাতদিন স্বয়ংক্রিয় কান্নায় ভেজা চোখ এভাবে রেখে দিলে একদিন সত্যিই অন্ধত্ব আসবে। ঝাকলিনের ব্যাপারটা স্বভাবই এবং বিজ্ঞানতই আলাদা। চোখের অশ্রুগ্রন্থি বা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড শুকিয়ে যাচ্ছে। তার ওষুধ আছে, ফোঁটা দিতে দিতে সারে, কিন্তু সেরেই যে থাকবে এমন না।

তবু কতরঙের ছবি আছে আঁকা

আমার চোখে জল
ওর চোখে নেই
অথচ
আমার মন খুশী
ওর দুঃখ সবেতেই

- এই অবস্থার পরীক্ষামূলক চিকিৎসা করতেই সাইকো-ল্যাক্রিমাল থেরাপির পরামর্শ। ডক্টর জাইলিন্ড আমাদের দুজনেরি কিছু জিন মিউটেট করাবেন, কিছু ওষুধ, কিছু হিপনোসিস, কিছু জিন-পাল্টাপাল্টি; এবং তিনি আশা করছেন যে এতে আমরা দুজনেই সেরে উঠবো। কিন্তু এই পাল্টাপাল্টি-বদলাবদলির জন্য আমাদের যৌথ-সাহায্য, একটু বন্ধুত্ব ও কিছুটা মানসিক আদান-প্রদান প্রয়োজনীয়। অসুখ বা অবস্থা সারাইয়ের কারণে আমরা দুজনেই সায় দিলাম। এই ঘটনার

সময় আমার বয়স ৩৯ আর ঝাকলিন বা জ্যাকি ৩১। মা মারা যাওয়া ছাড়াও তার সদ্য বিবাহবিচ্ছেদ (প্রথম) হয়েছে যা ইতস্তত, আকস্মিক মনাঘাত ও বিমর্ষতার আরেক কারণ।

জলে নেমো না, আর থৈ পাবে না

আমরা সেরে উঠতে লাগলাম। আমার চোখ শুকিয়ে উঠছিলো। ঝাকলিনের চোখে স্বাভাবিক কারণে জল আসছিলো। মাস দুয়েক পরে হলেও বেশ কয়েকবার মার কথা ভেবে, পুরনো প্রিন্ট- অ্যালবামে মায়ের ছবি দেখে চোখ ভিজেছিলো যদিও তেমন নোনাজলের জোয়ার কখনো এলোনা। শুধু পরীক্ষা-চিকিৎসাগত কারণে নয়, একত্র সুস্থতালাভের মধ্যে একটা সখ্যতা এমনিতেই আসে। নিজেদের সাথে নিজেদের কথা বলতেও ভালোলাগছিলো; একটা হাল্কা বুনোফুল, কখনো কি-জানি-ল্যাভেন্ডার-কিনা গন্ধ আসছিলো জ্যাকির থেকে; সেও জানি কি একটা গন্ধ পেত, মাঝে মাঝে আমার খুব কাছে মুখোমুখি মুখ এনে প্রাণভরে নিঃশ্বাস টেনে চোখ ভরাট করে হাসতো। এর মানে আমাদের ডক্টরের চেম্বারের বাইরেও দেখা হচ্ছিলো। 'কাফে দু-নোয়ার' নামে একটা কফিশপে। ছোট্ট দোকান, সব দেয়াল ঘন নস্যি রঙের, আসবার চকচকে কালো, কফি শস্তা। শেষে একদিন যখন আমি ওর সাথে ডেট-এ যেতে চাইলাম, ঝাকলিন বললো - বেশ, বাট উই হ্যাভ হ্যাড সো মেনি অলরেডি। তাতে বুঝলাম সেই সেই কফি-সাক্ষাতগুলোকে মনে মনে 'ডেট' ধরে নিয়েছিলো।

আমরা ওলেনট্যাঙ্গি নদীর ওপর একটা হাউসবোট-রেস্তোরাঁয় যাই। আর সেখানে গিয়েই যা ছিলো এযাবত প্রায় জলবৎতরল, তার মধ্যে ঘনপ্রলয় ও ইন্দ্রজালরচনা শুরু। ডেক-রেস্তোরাঁ। ঢিমে আলো ও পিয়ানোবার সজ্জিত। সে মৃদুসঙ্গীতের আহ্বানে কোনো কোনো নারী-পুরুষ একসাথে নাচছিলো। পিয়ানোর চাবিগুলো আমার আঙুল টানছিলো। হাত নিশপিশ করছিলো। পায়ের রক্ত নাচের ছন্দের জন্য ওয়ার্ম-আপে। আমরাও উঠে পড়লাম। আর তখনই ক্রমশ ধীরে, পরে তোড়ে, সেই সাঁঝেরবেলায় জল এল মোর চোখে। মোদের চোখে। প্রায় একসাথে। আমরা টেবিলে ফিরে গিয়ে বসি। ন্যাপকিনে চোখ মুছি। ন্যাপকিন সপ্‌সপ্‌ করে মুহূর্তে। আবার নতুন ন্যাপকিন চাই। দুজনে দুজনের দুরবস্থায় সমব্যাথী হই, টেবিলের ওপরে হাত ধরি, টেবিলের নিচে। জুতো খুলে টেবিলের নিচে একে অন্যের পায়ে পা ঘষি। আর চোখে চোখে নদী বইতে থাকে। খাবারের অর্ডার নিতে আসা হোস্টেস আমাদের দেখে প্রথমে ভীষণ আদুরে হেসে বলে - বেশ তোমাদের আরেকটু সময় দিই তাহলে - বলে চলে যায়, পরের বার এসে আমাদের দেখে সেও কেঁদে ফেলে। কী হয়েছে? তোমাদের কি সুন্দর দেখাচ্ছে, তবু তোমরা কাঁদছো কেন? আমারো যে কান্না পাচ্ছে - ব'লে মেয়েটা...

এ সময় এ নদীর নেই কোনো ভরসা

কী হয়েছে? জানিনা তো। কিন্তু কিছু একটা হয়েছে। আমরা দুজনে দুভাবে একটা অন্য অনুভূতির শিকারও। একটা টান। তীব্র, শিকড় উপড়ে ফেলা টান, মনে, মাথায়, পেশিতে, রক্তে, সব গ্রন্থিতে...নদীর জলের দিকে তাকাবার, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার। একে অন্যের হাত চেপে ধরে আমি আর ঝাকলিন, কোনোক্রমে নিজেদের সংবরণ করি। খাবার শেষ না করেই দ্রুত ফিরে আসি। ঝাকলিনের অ্যাপার্টমেন্টে প্রথমে, ওকে ছাড়তে। গাড়ি থেকে নেমেই ঝাকলিন পড়িমড়ি করে দোতলায়। আমি অনুসরণ করি। গাড়ির ইঞ্জিন চলছে, দরজা খোলা। তবু। কি যেন

এক জৈব তাড়না। টানে, পিছু নেয়। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই জ্যাকি দরজা খোলা রেখেই বাথরুমে ছোটে। বাথটাবের কল খোলার শব্দ। বাথরুমের দরজা ভেজানো। বাথটাবে জল পড়ার আওয়াজ। হঠাৎ দরজা আরেকটু খোলে। সে একটা একটা করে জামাকাপড় ছুঁড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। দ্রুত। বহতা জলের শব্দে আমার ঘোর আরো তীব্র তখন। আরো তামসিক। এই পৃথিবীর তিনভাগ আর মানবশরীরের ষাট শতাংশ জল যে আসলে এক উন্মাদ মাদক আমি সেই প্রথম টের পাচ্ছি। ছোট জল বড়ো জলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি মুহূর্তে বাথরুমে ঢুকি। কোনো বোধ কাজ করে না, জামাপ্যান্ট যুবকসাপের খোলসের মতো ছেড়ে বাথটাবে জ্যাকির সঙ্গী হই। আপত্তি তো দূরে থাক, সে আমাকে কাছে টেনে নেয়, দেখি তার চোখমুখের রক্তসঞ্চার, সে আমার বুকপিঠেঘাড়ে মুখের আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু নগ্ন শরীরদ্বয়ের অন্যান্য স্পর্শের কোনো আলাদা অনুভূতি নেই, শুধু টের পাই আরো দ্রুত যেন জল কাটছে চোখে। শাওয়ার তো পুরোদমে আছেই, তবু আমি আর ঝাকলিন একে অন্যের সাথে মিশেও দৃষ্টিবিভ্রমে বারবার চোখ ঝাপসা। যেন মাথার ওপর পর্বতাঞ্চলের পাগল নির্ঝরিনী আর পায়ের নিচে প্রত্ন ল্যাটারাইট।

একটু পরে জলের তোড় বাথটাব ছাড়ালো, আমরা শাওয়ার বন্ধ করলাম। দেখলাম বাথটাবের ড্রেনপ্লাগ জ্যাকি লাগাতেও ভুলে গেছে। জল জমারই কথা নয়। তবু জল যেন বাড়ছে, বাথরুমের মেঝে ভাসিয়ে ফেললো পুরোটা, তারপর দরজা ঠেলে শোবার ঘরের কারপেটে। ঝাকলিন চেঁচিয়ে উঠলো – নিচের তলার ঘরে চুঁইয়ে ঢুকবে, হাজার হাজার ডলার ফাইন হবে। আমরা আঁতকে উঠে দুই উদোম-আদিম, আমাদের পোশাক আশাক তোয়ালে সব দিয়ে ঠেসে ধরলাম জলের গলা। সে থেমে গেল, শুকিয়ে গেল। আস্তে আস্তে ঘাম এলো আমাদের শরীরে। শোবার ঘরের কার্পেটে আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে নিজেদের অবারিত কলেবর দেখি। ঝাকলিনের ক্রীম রঙের শরীরের এখানে ওখানে একটু চারকোল ঘষা। টের পাই আমাদের চোখও শুকিয়ে গেছে এই প্যানিক-প্রয়াসে। গালের ওপর মরুভূমির শুকিয়ে যাওয়া নালার দাগ।

কিন্তু অচিরেই আবার চাকচিক্য ফিরে এলো আমাদের চোখে। আস্তে আস্তে। ঝলসানো আলো থেকে শিশিরবিন্দুর হীরেদ্যুতিতে। এবং এভাবে আসার কথা নয়, কিন্তু এলো। ক্রমশ আরো সজলতা, শেষে গড়িয়ে পড়তে লাগলো দুচোখের মেঘনা-যমুনা।

ঝাকলিন আর আমি, দুজনেই কৃশকায়, মাঝারি-উচ্চতার। ৫.৩ আর ৫.৭। দুজনেরি মাথায় অনেক চুল, চোখ আর ভুরু ঘন, আর সদ্য আবিষ্কার করছি যোনিকেশও ঘন। অতল জলের এই মারণাহ্বান থেকে জ্যান্ত ফিরে এসে আমরা আস্তে আস্তে নিজেদের নগ্নতা আবিষ্কার করছিলাম। বাঁকানো সেতুর দুদিক দিয়ে উঠে মাঝখানটায় এসে আমরা মোহনা থেকে আরো বড় ঢেউয়ের আসন্ন শব্দ টের পাচ্ছিলাম। আদরে তলিয়ে গেলাম। নিজেদের মধ্যে অনেক রাস্তা খুঁজে পেলাম। আর একাধিক প্রবেশপথ। ঝাকলিন বললো আমার জিভ আর ঠোঁট সবচেয়ে সুন্দর। আমার মনে হলো ওর কানের পেছন, দু-বৃন্তের উপচ্ছায়া বা পেনাস্ত্রা আর ক্লিটোরিস ও তার চারপাশ। কিন্তু এই সম্মিলিত অশ্রুপ্রবাহের মানে বুঝতে পারছিলাম না। তার ফোঁটা ও প্রবাহ ক্রমশ বড়ো হচ্ছিলো।

নিজেদের শরীরে নিজেদের সাড়া পেতে পেতেই জ্যাকি আমাকে ওই শরীরমুদ্রার মধ্যেই বললো – কালকেই কিন্তু ডক্টর জাইলিন্ডের কাছে একবার আমাদের... ঠিক এইসময়ে আমার মনে পড়লো নিচে গাড়ির ইঞ্জিন চালু, দরজা খোলা, আমি আঁতকে উঠলাম, ছাড়িয়ে নিলাম ঝাকলিনের শরীর, দ্রুত জামা পড়তে পড়তে টের পেলাম চোখ শুকিয়ে গেলো, অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা খাটের ওপর জ্যাকির চোখও এখন শুকনো।

জলখেলা খেলো না আর তুমি সহসা

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে জাইলিন্ড চুপ করে রইলেন, সব শুনে। তারপর আমাদের দুজনকেই প্রথম যে প্রশ্নটা করলেন - আপনারা সাঁতার জানেন কি? আমরা জানি, বললাম। ধীরে ধীরে জাইলিন্ড যা বললেন তাতে রহস্যের উদ্ঘাটন হলো। অন্তত কিছুটা। আমরা সেরে উঠেছি ঠিক। কিন্তু এই সমস্ত মিউটেশন ও জিন-বদলাবদলির পর একটা ব্যাপার ঘটে। যা আমাদের মধ্যে ধরা পড়ছে। অশ্রু বলে নাকি আসলে কিছু নেই, সবই আনন্দাশ্রু। আনন্দ শৃঙ্গারোহী হলে তবে সে আসে। আর বিপুল শোকে, বিষে বিষণ্ণতায় মরে যায়। যার ফলে মৃত্যুর তীব্র দুঃখে চোখ ভেজে না, কিন্তু দারুণ কমিক সিরিয়াল দেখতে দেখতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। আবেগ যতক্ষণ তার স্বাভাবিক রেঞ্জের মধ্যে থাকে অশ্রুগ্রন্থির ব্যবহারও থাকে স্বাভাবিক। অন্য সবার মতো। রেঞ্জের বাইরে গেলেই লক্ষণ উলটে যায়। শুধু তাই নয়, জলাশয়ের প্রতি এইসময়ে এক প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে। ডুবে মরার ঘটনাও নাকি আছে। আরো একটা ব্যাপার। এই চোখের জল যদি অন্যজলের সাথে মেশে, এক মৃদু এক্সোথার্মিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার মাস্ অল্প বাড়ে এবং ভল্যুম সাঙ্ঘাতিক রকমের। বাথটাব ছাড়িয়ে শোবার ঘরের কার্পেট ভেজার রহস্যভেদ হয়।

এর সাথেও বেশ কিছু গবেষণার কথা বললেন যার মধ্যে শুধু বিজ্ঞান নয় সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি মিশে। আমরা আর ঠিক মূলধারার জীবনের সদস্য নই, এক বিকল্পব্যবস্থায় আমাদের শরীর, মন সাড়া দিতে শুরু করেছে। সেই একই বিকল্পব্যবস্থার একাংশ পৃথিবী ও মানবজাতির ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ে সমাজব্যবস্থার ব্যাখ্যা। মানবেতিহাসকে এ যাবত প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন করে দেখা ও লেখা হয়েছে। প্রকৃতি ও শারীরবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন করে। এই বিকল্পব্যবস্থার মানুষরা মনে করে একটা সময় ছিলো যখন অধিকাংশ মানুষের জিনগঠন ছিলো ভিন্ন। অনেকটা আমাদের আজকের মতো। সুখী সমাজের আনন্দাশ্রু, থুড়ি, অশ্রুর প্রবাহে সেইসব সভ্যতার আশেপাশে নদীর আকার বড়ো হয়ে উঠতে থাকে; এমনকি অন্য জলাশয়, হ্রদ, যেসব হ্রদকে ভূতাত্ত্বিকরা বৃষ্টির জলে নির্মিত বলছেন তার অনেকগুলোই কিন্তু অশ্রুজলে পুষ্ট। পাশাপাশি দুঃখী, অভাবী, ধ্বস নামা সভ্যতার চারপাশ জলাশয়হীন হয়ে যেতে থাকে। নিরানন্দই যে মানবমৃত্যুর কারণ এটা আসলে কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার না, জলাভাবের কারণে। কোন জল কখন ও কেন নোনতা এসবেরও ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা বুঝলাম আমরা একভাবে সেরে উঠেছি, আর অন্যভাবে বিপন্ন। কেননা মূলধারার জীবন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। তার সাথে মানিয়ে চলার জন্য ডক্টর জাইলিন্ড আমাদের কিছু পরীক্ষামূলক উপদেশ দিলেন। আমরা তার ওপরেও আরো কয়েক আস্তর ব্যক্তিগত পরীক্ষা চালালাম। এইভাবে...

জিন-বদলের কারণে হোক কি স্বাভাবিক, মন ও রুচি মিলে যাচ্ছিলো। আমার আর ঝাকলিনের। দুজনেই উদারপন্থী, সঙ্গীতপ্রেমী, যুদ্ধবিরোধী, রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন, লিচু খেতে ভালোবাসি, ম্যালবেক, অনুস্থাপন শিল্পের ভক্ত, হিমালয়ের, ভূমধ্যসাগরের, সব্জি আর মাছের, জ্যঁ-লুক গোদার আর বেলা তারের। আমি যে শখের জ্যাজ পিয়ানিস্ট তাকে ভালোবেসে জ্যাকি একের পর এক তেলোনিয়াস মঙ্কের সিডি কিনতে থাকে, আমি ওর প্রেমে পড়ে জুলিয়া চাইল্ডের রান্নার বই। সহ ও সমজীবনের খোঁজে আমরা একদিন ঝাকলিনের অ্যাপার্টমেন্টে মুভ-ইন করি।

দরজার ঘরের দিকটায় দুটো জামাটাঙানোর হুক লাগাই। যাতে বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকেই আমরা জামাকাপড় খুলে ওটায় টাঙিয়ে রাখতে পারি। ঘরের মধ্যে আমরা সবসময় নগ্ন অবস্থায় থাকি। এমনকি শীতকালেও। ফলে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে দেখা করি বাইরে। এভাবে নিয়মিত নিজেদের নিরাবরণ দেখতে দেখতে শারীরিক আকর্ষণের মানসিক অবস্থাটা পালটে যায় কিছুটা। আবেগ আসার উত্তুঙ্গ অবস্থা কিছুটা কাটে। তার ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। কিছু খারাপ খবর - অ্যাকসিডেন্টের, বন্যার, যুদ্ধমৃত্যুর - আমরা টেপ করি। স্নানে যাবার আগে এগুলো দেখে নিই। যাতে জল ঘাঁটার সময়ে মন খারাপ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। একসাথে স্নান করিনা। করলেও একটা বিশেষ ওষুধ খেয়ে। প্রচন্ড হাসির সোপ দেখিনা। সঙ্গমকালীন তাড়াহুড়ো করিনা। এছাড়াও চোখের কোণে একটা প্যাচ লাগাতে দেওয়া হয় আমাদের। টিয়ার-ডায়পার। বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য। সেই ডায়পারের কেমিকাল জল শুষে নেয়। নিয়ে জেল তৈরি করে। খুব ভারী হয়ে যায়। তখন খুলে ফেলে দিতে হয়।

সাগর ডাকে, আয় আয়

এইসব করতে করতেই একটা বিশেষ ক্রুজের সন্ধান পাই। সাইকো-ল্যাক্রিমাল ক্রুজ। উড়ে যেতে হবে বার্সিলোনা। সেখান থেকে ছাড়বে। আমাদের প্রিয় ভূমধ্যসাগর থেকে। সে জাহাজ সেখান থেকে মার্সেই হয়ে অনেক নদী, উপনদী, শাখাসাগর হয়ে, নানা দেশ ঘুরে ঘুরে, তুনিসিয়ার তুনিস, অ্যালজিরিয়ার অ্যালজিয়ার্স, ওরান ইত্যাদি ঘুরে ফিরে আসবে বার্সিলোনায়। সেখানে নেমে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ফিরতি প্লেন ধরবো। খুব শান্ত, নির্জন, নিয়ন্ত্রিত প্রমোদতরী। কোনো নাচা, গানা, আবেগপ্রবণ সিনেমা, কামনা-উদ্রেককারী খাবার পানীয়, মাদক, সঙ্গীত, হাসি-ঠাট্টার সুযোগ নেই। যতরকমভাবে তীব্র আবেগ থেকে যাত্রীদের দূরে রাখা যায় তার রকমারি ব্যবস্থায় ঠাসা। ডেকের বিরাট একটা অংশ ঘেরা যাতে কেউ জলের কাছে না যেতে পারে।

দারুণ দিনগুলো কাটছিলো জাহাজের ওপর। জলের সাথে নিজস্ব সমঝোতা ছাড়াও প্রেম, প্রীতি ও বন্ধুত্ব - তিন ডুবুরির মতো একই পোশাকে সে জলে নেমে গিয়েছিলো। ছ'তলার ওপর থেকে তাদের আলাদা করা যাচ্ছিলো না। আমরা চাইছিলামও না। আমি কোনোদিন মনোপলি খেলিনি, ঝাকলিন স্ক্র্যাবল। সারাদিন এই নিয়েই আমাদের পারস্পরিক মাতামাতি ও পারদর্শিতা। চোখ নিয়ে একটুও সমস্যা নেই। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে, এশহরে ওশহরে জাহাজ থামছে। এইভাবেই একদিন এক ক্ষয়াটে দ্বীপে আমরা নামলাম।

চোখে নামে বৃষ্টি, বুকে ওঠে ঝড় যে

তুমি কি সত্যিই আমার ছিলে? দ্বীপে নেমে একথাটা কেন জানিনা মনে হলো। দ্বীপটা তেমন বলার মতো কিছু না, অনেকটা বালিয়াড়ি, তারপর আস্তে আস্তে সামান্য সবুজ। ক্রমশ জংলা। কিন্তু প্রমোদতরীর ছকে বাঁধা স্থানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম; তীরে নামামাত্র নতুন দেশের স্বাধীনতা। ঝাকলিন হাল্কা সোনালি একটা কস্ট্যুম পরে, সঙ্গে বীচ স্যান্ডাল, সাদা ক্যানভাস টুপি, কাঁধে একটা হাল্কা পার্স। দারুণ দেখায় ওকে, এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে আমরা তট ছেড়ে দ্বীপের বাঁধানো সড়ক পাই। স্থানীয় মানুষ ইস্পানির মতো একটা ভাষা বলে। আবার কেউ কেউ আরবী। এক সময় আমি আর জ্যাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। ওর

তিনটে মেয়ে আর একটা ছেলের দলের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিলো, তাদের সাথে ও কোথায় যেন চলে যাই। আমি একাই ঘুরছি, ছবি তুলছি। এভাবে অনেক বেলা হয়। খিদে বাড়ে। আমরা কেউ সেলফোন সঙ্গে নিইনি। আর থাকলেও কাজ করতো কিনা কে জানে। একটা জায়গায় থেমে অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে প্রমোদতরীতে ফিরি। অপেক্ষা করি জ্যাকির।

ক্রমশ বিকেল আসে। এখানে ৮টা অব্দি আলো থাকে। কিন্তু সাড়ে ছটার মধ্যে ক্রুজের সবাই ফিরে আসে। অথচ ঝাকলিনের দেখা নেই। তার দলের মেয়েগুলো আর ছেলেটা ফিরে এসেছে। তারা বলে জ্যাকি সারাক্ষণ ওদের সাথে ছিলো না। একসময় ওরা তাকে হারায়। সাড়ে আটটাতেও যখন ফিরলো না আমার মনের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা হতে শুরু করে। হাজারো অজানা ভয়ের সন্ত্রাস। জাহাজের লোকেরাই পুলিশ ডাকে। তারা কাজে নেমে পড়ে। জাহাজ এখন ছাড়বেনা এমন ঘোষণা করা হয়। পরে ঠিক করা হয় আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওরা রওনা হয়ে যাবে, দুদিন পর আমাদের তুলে নিতে আসবে।

সাগরসৈকত ফাঁকা হয়ে এসেছে। প্রায়ান্ধকারের শেষে দিকরেখার একটা মাত্র রক্তচেরা দাগ। তটের সামান্য দু-তিনটে দোকানের একটা আমাকে বসতে দিয়েছে ওদের চত্বরে। একটা তোয়ালে দিয়েছে গায়ে জড়িয়ে রাখতে। কেননা অন্ধকারের সাথে সাথে নামছে তাপমাত্রা। শীত করছে, ঝাকলিন এখন কোথায়, কী অবস্থায়, শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে কিনা...এইসব ভাবতে ভাবতে ওর চুল, চোখ, ওর গলা, ওর শরীরের ফিকে ল্যাভেন্ডার, ওর সাথে দেখা হবার পর থেকে আমাদের বিকল্পজীবনের উন্নয়নের সব সবটা পরপর মনে পড়ে যাচ্ছে...আর পাঁজরে কি যেন চুরচুর হয়ে যাচ্ছে, মাঞ্জা দেবার আগে যেভাবে পাড়ার ছেলেরা এককালে কোকের বোতল ভাঙতো....সেরকম...আর এভাবেই আচমকা চোখ ভারী হয়ে এলো ... সাথে সাথে নোনা জলের বান... গাল, চিবুক পেরিয়ে সে ছোটো নদী এখন বুকের কাছে। ঠিক তখনই স্বাভাবিক চোখের জলের প্লাবনের মাঝে ভয়, দুঃখ ভেদ করে আমার মধ্যে এক বিস্ময় এলো -

বিষাদ থেকে তো আমার চোখ ভেজার কথা নয়। তাহলে?

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কৌরব, অগাস্ট ২০১৪